অঞ্জন দাসের তৃতীয় ছবি ফালতু

রজত রায়

সাদায় - কালোয় মানুষের বেঁচে - বত্তে থাকা

পরিচয়লিপি -- প্রয়োজনা প্ল্যানম্যান মোশন পিকচার্স; কাহিনিসূত্র - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - এর ছোটগল্প রানীরঘাটের বৃত্তান্ত; পরিচালনা ঃ অঞ্জন দাস; চিত্রনাট্য - পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প নির্দেশনা ঃ ইন্দ্রনীল ঘোষ ; শব্দগ্রহণ ঃ অনুপ মুখোপাধ্যায়; অভিনয়ে - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী হালদার, যশ পণ্ডিত, মঞ্জরী ফাড়নবীশ, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, অমিতেশ ভট্টাচার্য, দেবেশ রায় চৌধুরি, মাসুদ আখতার, দেবেশ মুখোপাধ্যায়, নির্মল কুমার, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

প্রতিভাবান এবং অন্য ধারার পরিচালক অঞ্জন দাস তাঁর তৃতীয় ছবি 'ফালতু' আমাদের উপহার দিলেন অবিভক্ত বাংলার সম্পূর্ণ গ্রামীণ পটভুমিতে। যদিও লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অবতরণিকা বাদ দিয়ে তাঁর মুল গল্পটি শু করেছেন এইভ াবে ---

'সে অনেক বছর আগের কথা ।----'
মনে হতে পারে হয়তো বা দু / তিনশো বছর আগের কথা। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ মাত্র আট / নয় দশক আগেকার পুরানো মডেলের বাস গাড়ি ছবিতে দেখানো হয়েছে। গাড়ির মডেল দেখে এবং চরিত্রদের সংলাপ শুনে মনে হয় অঞ্জন দ াস এবং তাঁর দুইসহযোগী চিত্রনাট্যকার গল্পটিকে সম্ভবত ১৯৩০ -এর দশকে ফেলে নিয়েছেন। বোঝা যায় তখনও বাংল ায় ১৯৪৩ -এর দুভিক্ষ হয়নি, ১৯৪৬ - এর দাঙ্গা হয়নি, হিন্দু এবং মুসলিম এই দুই ধর্মের মানুষদের ভেতরে কোনে ারকম সাম্প্রদায়িক সমস্যা নেই এবং সবার উপরে ভয়ংকর সর্বনাশা দেশভাগ তথা স্বাধীনতা হয়নি!
সেই সময়ে, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলার সীমান্তে, প্রধানত মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর -- ফারাক্কা এবং বীরভূমের সন্নিহিত কিছু অঞ্চল নিয়ে কাহিনিটির বিস্তার। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প তথা অঞ্জন দাসের ছবিতে অতি সাধারণ নিম্নবর্গীয় গ্র াম্য মানুষের জীবন সুখে - দুঃখে, সাদায় - কালোয়, হাসি - কান্নায় ফুটে উঠেছে এক গভীর জীবনজিজ্ঞাসা এবং জীবনের প্রতি ভালবাসা নিয়ে। (অমিত গুহর কণ্ঠে বাউল গান 'মন ভেবে ভেবে বল কী পাবি তুই মিছে এ সংসারে' ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে অনেকটা থিম মিউজিকের মতো) (ষড় রিপুর এক রিপু কাম যেমন ছবিতে গুত্ব পেয়েছে, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে মনুষ্যত্বের আর একটি উজ্জ্বল দিক --- বাৎসল্য, অপত্যস্নেহ।
গোষ্ঠীবদ্ধ সামান্য কিছু মানুষের (৬২টি পরিবার) সংহত জীবনযাত্রার মধ্যে এক নবীন যুবক 'ফালতু' (যশ পন্ডিত অভিনীত) খুঁজে বেড়ায় তার নিজের পিতার পরিচয়। পিতার পরিচয় না জানতে পারলেও যুবকটি কিন্তু তার শৈশব থেকেই পিতুস্নেহের কোনও অভাব অনুভব করে নি। গ্রামের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক পুষই এই যুবকটিকে ভালবাসে অসীম অপত্যস্নেহে। গ্রামের একাধিক মানুষের মনে, হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে, একই সঙ্গে কাজ করে দুটি প্রবল মানসিক অনুভূতি .....সুপ্ত পাপবোধ এবং প্রকাশিত বাৎসল্য। ভাগীরথী নদীর ঘাটের ইজারাদার চৌবেজি (সুমন্ত মুখোপাধ্যায় অভিনীত), শম্ভু মাঝি, চাষের চোকানের মালিক জগন্নাথ (প্রদীপ মুখোপাধ্যায় অভিনীত), বাসের ড্রাইভার ইসমাইল (বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়), খুনে ডাকাত ইব্রাহিম হাজি (কর্ণাটকের অভিনেতা / পরিচালক মাসুদ আখতার), বাস - কন্ডাকটার মদন এবং সর্বোপরি মৃৎ শিল্পী পালবাবু (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় যে ছবিকে সমৃদ্ধতরকরেছে) সকলেই দেশে গুণে ভালোই মন্দোই

মিশিয়ে একে বারে জীবন্ত। চিত্রনাট্য কার / পরিচালকের নতুন উপস্থাপন মৃৎ শিল্পী পালবাবুর চরিত্রটি ছবির গল্পের পা রিপার্শ্বিকের সঙ্গে একেবারে জুতসই হয়ে মিশে গেছে। আর চরিত্রটিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সহজ স্বাভাবিক অভিনয় করে পুরো ছবিটার মর্যাদাই অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। রানীঘাটের বসতিতে এক ঝড়বাদলের রাতে পাগলি সুরেশ্বরীর আ বির্ভাব এই পালবাবুর চোখেই প্রথমে পড়ে। মুস্তাফা সিরাজের গল্পে এই অংশটুকু নেই, কিন্তু ছবিতে সংযোজিত দৃশ্যটি খুবই সুপ্রযুক্ত। ইন্দ্রানী হালদার রানীরঘাটে আবির্ভাবের প্রথম দৃশ্য থেকেই সুরেশ্বরীর চরিত্রটিকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। ধর্ষণের দৃশ্যগুলি রীতিমতো দুরূহ, কিন্তু পরিচালক এবং অভিনেত্রী নিপুন দক্ষতায় সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ময়রা বুড়ি, জগন্নাথের কিশোরী কন্যা --- এদের যথাযথ স্থান ছবিতে আছে, কিন্তু তিন কন্যাসহ ইসমাইল ড্রাইভারের স্ত্রীর এবংপিতৃহীন কিশোর ফালতুর প্রতি তার অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং চাপা ঘৃণার প্রসঙ্গ পরিচ ালক অঞ্জন দাস এড়িয়ে গিয়ে ভালই করেছেন। এই উপাদনগুলিকে গল্পে ঠাঁই দিলে গোটা ছবির লিরিক্যাল ধাঁচটা একেবারে নষ্ট হয়ে যেত।

বাইরে থেকে আসা ৬২টি পরিবার জঙ্গিপুর আর ফারাক্কার মাঝামাঝি জায়গায় ছোট ভাগীরথী নদীর তীরে একটি ঘাটে রোনীরঘাট) এসে বসতি স্থাপন করে। সুখে দুঃখে এই দরিদ্র মানুষগুলির একটা যৌথ জীবনযাত্রা চলছিল। ধর্মের কোনো বাধা - নিষেধ সেখানে ছিল না। এহেন একটি অজ পাড়াগাঁয়ে ঝড়জলের এক রাতে হ্যারিকেন হাতে নিয়ে প্রবীন পালবাবু আবিষ্কার করেন বহিরাগতাএক উন্মাদিনী যুবতীকে। সেই রাত থেকেই পাগলিটি রানীরঘাটের বাসিন্দা হয়ে গেল। ইসম াইল ড্রাইভার, চায়ের দোকানের মালিক জগন্নাথ, মদন কন্ডাকটার, ডাকাত ইব্রাহিম, শম্ভু মাঝি --- কেউই ভাগ্যবিড়ম্বিত এই অসহায় নারীটিকে যৌন নির্যাতন করার সুযোগ ছেড়ে দিল না পাগলিটি অন্তঃসত্ত্বা হল, ময়রা বুড়ির প্রচ্ছন্ন মমতা এবং কিঞ্চিৎ অভিভাবকত্বে মেয়েটির সন্তান ভুমিষ্ঠ হল। পিতৃপরিচয়হীন শিশুটির স্বতঃস্ফুর্তভাবে নাম হয়ে গেল 'ফালতু'। ছেলেটি তার শান্ত স্বভাব, মিষ্টি ব্যবহার এবং নম্রতা দিয়ে গ্রামের সকলের মন জয় করে নিল। রানীরঘাটের বাষট্টিটি পরিবারই ফালতুকে তাদের আপনজন বলে মেনে নিল।

তাৎ পর্যপূর্ণ একটি সংলাপ .....' ছিলাম ৬২, এখন হব ৬৩'। বাচচাটি ইসমাইল ড্রাইভারের বাসে উঠে চিৎকার করে য াত্রী ডাকে, চৌবেজির কাছে গিয়ে রসগোল্লা খায় এবং সকলের চোখের সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে থাকে। তার প াগলি মা ময়রাবুড়ির কৌশলে 'ক্ষেপিমা' তে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পথ চলতি দেহাতি মেয়েরা ক্ষেপিমার থানে পয়সা এবং ফলমুল দিয়ে যায়। ময়রাবুড়িসুরিক্ষেপিকে লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি পরিয়ে কপালে প্রচুর সিঁদুর দিয়ে এবং মাথায় চুলের জটা সৃষ্টি করে তাকে কিছুটা অলৌকিক দেবীত্বে উত্তরণ ঘটিয়ে দেয়। শিশুটি অনাদরে অবহেলায় সত্যিকারের ফ ালতুর মতোই ধীরে ধীরে বড় হতো থাকে। কিছুদিন বাদে ফালতুর শৈশবেই সুরিক্ষেপির মৃত্যু হয়।

ইসমাইল ড্রাইভার অসীম স্নেহে ফালতুকে তার চেলা বানিয়ে নেয় এবং ধীরে ধীরে তাকে একজন পাক্কা ড্রাইভার বানিয়ে দেয়। সময়েৰ সাথে সাথে ইসমাইল বুড়ো হয়ে ড্রাইভারের কাজে অবসর নিলে নবীন যুবক ফালতুকে তার কাজটা দিয়ে যায়।

ফালতু এখন রানীরঘাট টের পাকাপোক্ত ড্রাইভার। গ্রামের সব মানুষ ফালতুকে ভালবাসে; শিশু, ক্ষেতের চাষী, মহিলা, বুদ্ধ মানুষেরা --- সবাই ফালতুর বাসের যাতায়াতের আওয়াজ শুনে সময় বুঝে নেয়। সকলেই তাকে নামগোত্রহীন ফ ালতু হিসেবেই মেনে নেয়। কেবল চায়ের দোকানের মালিক জগন্নাথের ষোল সতের বছরের মেয়ে টুকটুকি তার ফালতুদ ার একটা নাম দিতে চায়। নবীন যুবক ফালতুর সঙ্গে তণী টুকটুকির একটা স্নিগ্ধ ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গ্রামের সকলের চোখেই ওদের মধুর সম্পর্কটা ধরা পড়ে। বিবেকের টানে এবং অপত্য স্নেহের মায়ায় গ্রামের সব পুষ মানুষই ফ ালতুর সঙ্গে টুকটুকির বিয়ে দিতে চায়। গ্রামের মাতববরেরাসভায় বসে সবাই এই বিয়েতে এক কথায় রাজি হয়ে যায়। বিয়ের খরচও গ্রামের সবাই ভাগাভাগি করে নেবে স্থির হয়। সব কিছুই যখন অনুকুল তখন টুকটুকির বাবা জগন্নাথ এই বিয়েতে তীব্র আপত্তি করে বসে। সে ঘোষণা করে ফালতু আর টুকটুকি ভাইবোন। ভাইবোনে কখনোই বিয়ে হতে পারে ন া। পরিণামে নিষ্পাপ হতভাগি টুকটুকি আত্মহত্যা করে বসে।

ইতিমধ্যে সরকারের পুর্ত বিভাগের বাবুরা এসে মাপজোগ করে জানিয়ে যান নদীর উপর পাকা পুল হবে। রানীঘাটের জবরদখলকারী বাসিন্দাদের সবাইকে ঘরবাড়ি জমিজমা সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে সরকারি নোটিশ দেওয়া

হয়। রানীঘাটের বাষট্টিটি পরিবার সে আদশে মেনে নিতে বাধ্য হয়।
শুধু ফালতু ঠিক করে সে আলাদাভাবে বড় শহরে গিয়ে ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে একা একাই নতুন জীবন শু করবে। গ্র ামের সব মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ঘটিবাটি হাতে নিয়ে অন্যত্র নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে। ফালতুও তার গাড়ির ক্লিনারকেনিয়ে বড় শহরের দিকে ভিন্ন পথ ধরে রওনা হয়। কিন্তু একটু বাদেই সে ফিরে এসে রানীরঘাটের ম ানুষদের মিছিলেই যোগ দেয়। জন্মের সময় থেকেই যে মানুষগুলির সঙ্গে তার জীবন গাঁথা হয়ে গেছে তাদের ছেড়ে সে অ ালাদাভাবে বাঁচতে পারবে না। পিতৃপরিচয়হীন ফালতু সহ একদল মানুষ সবাই নিজেদের শিকড় খুঁজে নেবার জন্য অনিশ্চিত পদযাত্রা শু করে। এইখানেই অঞ্জন দাসের ছবির সমাপ্তি।
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্পে সমাপ্তিটি ছিল - সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, সাহিত্যের দিক থেকে যা অনবদ্য, আমার মতো প াঠকের চোখে যা জল এনে দেয়। সিনেমার আলোচনা করতে গিয়ে হয়তো সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তবুও বর্তমান পাঠককে ত ার কিছুটা স্বাদ পরিবেশন করতে ইচ্ছে করছে।
ব্রিজ তৈরি হয়ে গেলেও রানীঘাটের মানুষেরা কেউ গ্রাম ছেড়ে চলে যায় না। কিন্তু বিত্রি বাট্টা একেবার কমে যাবার ফলে গ্রামের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ধসে যেতে থাকে।
"ওই একটু দুরে ষাট সত্তর ফুট উঁচু পুলের উপর দিয়ে ঝকঝকে এক পোলি বাস যাচ্ছে পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। ড্রাইভারটি মধ্যবয়সী। সারা পথ দুধারে যত গ্রাম আছে, যত মানুষ আছে সবার কাছে তার মোটরগাড়ি সময় জানিয়ে দেয়।ক্ষেত্রে মুনিশ বলে ওঠে, ফালতুর গাড়ি গেল। নাস্তা এল কই? স্ল্যাবে ধান শুকোতে দেওয়া চাষি বউ, ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়েটা, খুঁটি ও দুরমুশ হাত গাইগ বাঁধতে আসা বুড়ি --- কার সঙ্গে না কথা বলে যাবে সে। গাড়ির গতি কমিয়ে বলে যাবে -- বোনটি ভাল আাছে তো? ও বুড়িমা, কাল দেখিনি কেন? ও বউঠান, মাছ রেখো তে চাট্টিখানি --- ফেরার সময় নিয়ে যাব। ওরা বলবে -- ফালতুদার খবর ভাল তো? বাবা ফালতু, দুটো মাথাধরার বড়ি এনে দিস বাবা, আমার সোনার বাবা! বিনোটির মাস্টারমশাই স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বললেন --- ফালতু। প্রেসত্রিপশানটা নিয়ে যা ব াবা! এই নে টাকা। বেশি লাগলে দিস, দোব'খন।
ফালতু এখনো ফালতু নামেই থেকে গেছে। যে তাকে নতুন নাম দিতে চেয়েছিল, রানীরঘাটের জগন্নাথের মেয়েটা, তার মতো নির্বোধ আর কেউ বা ছিল। বাপ যেই না বলা, তোরা ভাইবোন --- হতভাগী আপন দাদার সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে মা গঙ্গার বুকে শুয়েছে, এই তীব্র পাপবোধে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বিষাক্ত করবী - ফল, কেউ বলে ধুতরো, শিলে বেটে গিলে ফেলেছিল। বাপ কোন মতলবে কী বলছে, বুঝবি তো তলিয়ে।
এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই ফালতুর রাগ হয়। স্পিড বাড়ায়। পৃথিবীকে চাকার তলায় মাখিয়ে শোধ নেয়।"

অঞ্জন দাসের ছবির সমাপ্তি অনেক বেশি চিত্রানুগ (সিনেমাটিক) এবং ইঙ্গিতবাহী। পরিচালক আগাগোড়া ছবিটি এঁকে গেছেন মরমি গীতিকাবিতার স্টাইলে। আর এই কাজে তাঁকে সফলভাবে সাহায্য করেছেন শীর্ষ রায় তার ক্যামেরা অন্তর্নিহিত যাদু দিয়ে। বিশাল পর্দার ফ্রেমে শীর্ষ রায় সজীব গ্রাম্য পরিবেশ রচনা করেছেন নিপুন দক্ষতায়। অভিনেতাদের সমবেত আন্তরিকতা এবং সাবলীল অভিনয় দর্শকের চোখের সামনে রানীরঘাটের সমাজ ও জীবনযাত্রার একটি স্পষ্ট ছবি নিয়ে আসে। ফালতুর ভূমিকায় নতুন অপরিচিতমুখ যশ পন্ডিত অত্যন্ত মানানসই, ঠিক একই কথা টুকটুকির ক্ষেত্রে মঞ্জরী ফাড়নাবীশের বেলাতেও। এই দুই টাটকা তাজা তণ মুখ ছবিটিকে একেবারে বাস্তবের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। ইন্দ্রানী হ ালদারের অভিনয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাঁর ক্ষমতাকে অভিনন্দন জানাই। সংগীতের ব্যবহার সংযম ও ত াৎপর্যপূর্ণ। বাউল গানটির বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ অনেকদিন আমাদের কানে লেগে থাকবে।
সাদায় কালোয় মেশানো কিছু দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষের জীবনগাথা অঞ্জন দাস তুলে ধরেছেন সহৃদয়তার সঙ্গে। তাঁর পরিমিত বোধ, চিত্রভাষায় দক্ষতা এবং যথাযথ অভিনয় করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রীতিমতো উচচমানের। সাঁঝবাতির পকথ া, ইতি শ্রীকান্ত এবং ফালতু -- এই তিনটি ছবি করেই তিনি আমাদের মনে অনেক আশা জাগিয়ে তুলেছেন।
অর্ধমৃত, বিকলাঙ্গ, বিকৃত মস্তিষ্ক এবং চূড়ান্ত নির্বোধ বাংলা সিনেমার জগতে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন পরিচালক এখনও যথ ার্থ ভাল ছবি তুলে থাকেন, তাঁদের দলেই আর একটি নতুন নাম সংযোজিত হল, অঞ্জন দাস। আমরা এই পরিচালকের

উজ্জ্বল সাফল্যকামনা করি।

পুনশ্চঃ একটি মিষ্টিমধুর প্রসঙ্গ --- রসগোল্লা। অঞ্জনবাবুর জানা আছে কিনা জানিনা (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঠিকই জানেন) মুর্শিদাবাদ জেলার সমাজাস্তবতায় রসগোল্লার স্থানটি বেশ গুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে প্রায় আটচল্লিশ বছরের পুরনো একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। যুবক সত্যজিৎ পায় 'রানীরঘাট' - এর কাছাকাছি নিমতিতা গ্রামের জমিদার বাড়িতে জলসাঘর - এর (১৯৫৮) শুটিং করছেন দলবল নিয়ে। প্রায় তিন সপ্তাহ তুমুল মতবিরোধ হয়ে গেল টিমের সকলের খাওয়াদাওয়া ব্যবস্থায় অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। সুব্রত মিত্র ২২ দিন ধরে কাজ করে গেলেন ঠিকই, কিন্তু একবেলার জন্যেও প্রযোজকের অন্ন গ্রহণ করলেন না। তিনি ঐ গ্রামেই এক দরিদ্র মুসলিম বৃদ্ধার (তাঁকে মা বলে ডাকতেন) ছোট্ট কুটিরের দোকানে বসে দুপুর এবং রাত দুবেলাই শুধু ঐ বৃদ্ধার হাতে তৈরি রসগোল্লা খেয়ে ২২টি দিন কাটিয়ে দেন। ঐ বৃদ্ধা নিজে আমাকে কথাটি জানিয়েছিলেন।
ধান ভানতে শিবের গীত করতে হল শুধু ঐ রসগোল্লার জন্য। মুস্তাফা সিরাজও তাঁর গল্পে রসগোল্লার উল্লেখ করেছেন। চৌবেজি ৩/৪ বছরের বালক ফালতুকে একদিন বলেছিলেন -- যেদিন থেকে আমাকে বাবা বলা ছাড়বি, সেদিন থেকে রোজ তোর জন্য এক পো করে রসগোল্লার বরাদ্দ থাকবে। অঞ্জনবাবু হালকা করে এই রসগোল্লাকে একটু টাচ করে গেলে ছবিটিতে বাস্তবতা একেবারে খাঁটি মুর্শিদাবাদি চেহারা পেত।